ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: তাত্ত্বিক এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান*

Abstract

There are some ideological trends or psychological attributes among the people in every political system. Culture is composed by them. The attitudes, beliefs, values, sentiments and skills of the people in the society are the contributing factors of culture. These composing factors of culture also contribute to the political behaviour and resulting the political culture and political culture reflects in the national character of every nation. As a result, the cherished desire for democracy of a nation can be traced by its political culture. So, the study of the political culture especially culture of democracy has becoming a significant unit of contemporary political analysis of developing countries along with the developed political systems. In order to build up democracy from the root and to sustain it, democratic culture and process is particularly required. Because, democratic culture is such a condition where democracy grows up, develops and sustains. Democracy in Bangladesh is passing its formatting stage as a country of developing nations. In this regard, it is awfully significant to know the democratic culture of Bangladesh. This article attempts to analyse the culture of democracy in Bangladesh in the light of psychocultural theoretical approach.

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বিশ্বে 'গণতন্ত্র' শাসনব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। অধিকাংশ সরকারই 'গণতন্ত্র' বিষয়টিকে "বৈধতার সূক্ষ্ম প্রভা" (aura of legitimacy) হিসেবে ব্যবহার করেন। গণতান্ত্রিকায়নের আধুনিকীকরণের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে গণতন্ত্রের প্রথম প্রবাহেই (first wave of democratization) শিল্পায়িত ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো তাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিকায়নের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে এবং সেসব সমাজে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এবং এসব রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসনের করায়ত্ত থাকার কারণে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে সামিল করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এসব রাষ্ট্রের অধিকাংশই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শাসন ব্যবস্থার ধরন হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে

* সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা ১৩৪২

কার্যকর করার ক্ষেত্রে এসব দেশ তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি। কারণ অন্যান্য বিষয় ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনার বিষয়টি উক্ত সমাজের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কোনো জনগোষ্ঠীর পূর্ব-পুরুষদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তাদের বর্তমানকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক অনুশীলন ব্যতীত একদিনে বা কিছু দিনে গণতন্ত্র অর্জন করতে পারে না, বরং গণতন্ত্র শতশত বছরের চর্চা ও বিকাশের ফল। কিন্তু এসব দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত ধারা তেমনটা গড়ে উঠে নি। এরূপ কতিপয় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, তবে তার নৈপুণ্য নিম্নমানের (low performance)। অধিকন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত না হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে এসব দেশের অধিকাংশ দেশে অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের জনচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের প্রকাশ ঘটেছে এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশের জনগণের হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। ঐতিহাসিক কালপর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রয়াস এবং বিচ্যুতির (trial and error) মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ব্যাকরণসম্মতভাবে বা প্রথাসিদ্ধভাবে আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা সিভিক কালচার গভীরভাবে শিকড় গাড়ে নি। তবু গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বাঙালির মানসে জেঁকে বসে আছে। বাঙালির চেতনায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রবেশের কারণেই বৃটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু গণতান্ত্রিক ধারার সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালির এই গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের আরও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষণীয় উদ্যোগও অব্যাহত। এই প্রেক্ষাপটে একটি উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রকাঠামো হিসেবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ধারাটি কীভাবে সাধিত হচ্ছে এবং এ ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাড়া প্রদানের মাত্রা কতটুকু–তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। আর এ জিজ্ঞাসা থেকেই বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়টিকে এ প্রবন্ধের মুল আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র নতুন কোনো বিষয় নয়। কারণ গ্রিক দার্শনিক হতে শুরু করে আধুনিককালের তাত্ত্বিকদের আলোচনাতেও গণতন্ত্রকে একটি মুখ্য শাসনব্যবস্থা হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে। স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকাল থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আগ্রহ আরো বেড়েছে। যার প্রধান প্রমাণ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সব দেশ সমানভাবে সাড়া প্রদান করতে পারে নি। অর্থাৎ কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্র সফল হচ্ছে আবার কোনো কোনো দেশে হচ্ছে না। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে (democratic culture) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন। বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় ধরনের সমাজে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার কারণ হিসেবে সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করা হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের উপযোগী রাজনৈতিক সংস্কৃতি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হলো এমন এক প্রকার সংস্কৃতি, যা গণতন্ত্রের আদর্শকে লালন করে এবং তার বিকাশ ঘটায়। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিকগণ গণতন্ত্র সফল হবার একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতির বিশ্লেষণ শুরু করেন। বিশেষ করে ষাট ও সত্তরের দশকে এক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বও গড়ে উঠে। অ্যালমন্ড (Almond), ভারবা (Verba), পাই (Pye), ডাইমন্ড (Diamond), লিপসেট (Lipset), নাই (Nie), কিম (Kim) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অনুরূপ ধরনের গণতান্ত্রিক, যৌক্তিক ও অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি। অবশ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি বিশ্লেষণের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (intellectual history) মূলত গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল স্থিতিশীল গণতন্ত্র (stable democracy) প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু আচরণ (norms) ও প্রথার (customs) কথা উল্লেখ করেন; তিনি গণতন্ত্রকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (values and outlook of a middle class) হিসেবে বিবেচনা করে তার সাহায্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন।

অষ্টাদশ শতকে চার্লস দ্বিতীয় লুই এবং মন্টেস্কু-কে সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংস্থাপক (founder) হিসেবে দেখা যায়। মন্টেস্কুর *The Spirit*

of Laws গ্রন্থে একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রা, স্বাধীনতা, ধর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আচার-প্রথা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি একতা (integrity) এবং আস্থাভাজনতাকে (trustworthiness) গণতন্ত্রের কার্যকর মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মন্টেস্কুর পথ ধরেই ক্রমে রুশো, স্টেইল, বেনজামিন, কনস্টান্ট, গাইজট এবং টকবিল বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনৈতিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা করেন। Alexis D. Tocqueville সর্বপ্রথম ক্ল্যাসিক্যাল সমাজতাত্ত্বিক, যিনি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *Democracy in America* গ্রন্থে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কথা বলেন। সংস্কৃতির মানদণ্ডে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে জার্মান তাত্ত্বিকদের অবদানও অনস্বীকার্য। বিশেষ করে কান্ট, হেগেল, মার্ক্স, ম্যাক্সওয়েবার প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পরে তা অনেক আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী যেমন, ট্যালকট পারসন্স, এডওয়ার্ড শিলস প্রমুখের মধ্যেও দেখা যায়। এসব তাত্ত্বিকগণ মানুষের আচরণ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে অ্যালমন্ড, ভারবা, পাই প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তবে এক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে অ্যালমন্ড ও ভারবার *The Civic Culture* (1963) গ্রন্থটি, যেখানে স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও আচরণগত ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে সংস্কৃতির মাধ্যমে রাজনীতি বিশ্লেষণের এ তত্ত্ব সমালোচিত হয়। কিন্তু ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে আবার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে হান্টিংটনের The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর এবং সোভিয়েত ও পূর্ব-ইউরোপের পতনের ফলে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ধারা সূচিত হবার পর থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ বর্তমানে আবার কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে ব্যক্তি যে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় বসবাস করে তার অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধগত বিষয়ের প্রতি জ্ঞাত সাড়া প্রদানকে (learned response) বোঝায়। Almomd ও Verba তাদের *The Civic Culture* গ্রন্থে বলেছেন, স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। গবেষকদ্বয় পাঁচটি জাতির (আমেরিকা, ব্রিটেন, মেক্সিকো, জার্মানি ও ইতালি) উপর তুলনামূলক গবেষণা করে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কতিপয় উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। উক্ত উপাদানগুলোকে তাঁরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি না বলে পৌর-সংস্কৃতি (civic culture) বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁরা রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা, পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহযোগিতার মনোভাব, রাজনৈতিক জীবনে যৌক্তিক অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে পৌর-সংস্কৃতিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তখনই যখন অংশগ্রাহক সংস্কৃতি (participant political

culture) এবং প্রজাসুলভ সংস্কৃতির (subject political culture) মধ্যে সমন্বয় ঘটে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মকাণ্ডে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। Jean Baechler তাঁর *Democracy: An Analytical Survey* গ্রন্থে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে কতিপয় নাগরিক গুণাবলির (civic virtues) সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে সহনশীলতা (tolerance), স্বাধীনতা (freedom) ও অহিংসা (non-violence)-এর মতো গুণাবলির উপস্থিতি অন্যতম।

বর্তমান প্রবন্ধে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল উপাদান বা চালক হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে: (১) সহনশীলতা; (২) পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; (৩) সহযোগিতার মনোভাব; (৪) সমঝোতা ও ঐকমত্য; (৫) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ; শাসনব্যবস্থা পছন্দ ও গণতন্ত্র মূল্যায়ন; (৬) গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস; (৭) নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনা; এবং (৮) রাজনৈতিক সচেতনতা ও মূল্যায়ন।

১. সহনশীলতা

রাজনীতিতে সহনশীলতা বলতে ব্যক্তিবিরোধী মতামত, নেতৃত্ব ও কর্মকাণ্ডকে কতটুকু সহ্য করতে পারে তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের উদারনৈতিক ও বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজনৈতিক কাঠামোতে যে মূল্যবোধ ও বিশ্বাস (values & beliefs) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তার মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি (democratic culture) অন্যতম। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ধারণ করার জন্য জনগণ ও এলিটদেরকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারণ করতে হয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানগুলোর মধ্যে সহনশীলতা (tolerance) অন্যতম। সহনশীলতা হলো এমন এক প্রকার গুণ যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার নিজের সঙ্গে অন্যের বিশ্বাস ও মূল্যাবোধের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তার শান্তিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ সহনশীলতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনে 'সহনশীলতা' শব্দটি প্রথম গুরুত্বসহকারে আলোচনায় স্থান পায় ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধের (Religious War) সময় যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি বিশেষ ধর্মের একক আধিপত্যের পরিবর্তে সহনশীলতার ভিত্তিতে সাধারণ (common) ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। বর্তমানে সহনশীলতা শব্দটি উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সহনশীলতাকে রাজনৈতিক বিশ্বাসের (political beliefs) একটি দৃষ্টিভঙ্গি (orientation) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। সহনশীলতার প্রবক্তা-তাত্ত্বিকদের মধ্যে স্পিনজা (Spinoza), লক (Locke), ভলতেয়ার (Voltaire), মিল (Mill), রুশো (Rousseau) এবং কোঁৎ (Comte)

অন্যতম। নৈতিক ও দার্শনিক (moral & philosophical) মানদণ্ডের পাশাপাশি রাজনৈতিক আচরণের মানদণ্ডেও সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক সহনশীলতা বলতে একজন নাগরিক কর্তৃক অন্য নাগরিকের রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকে বোঝায়, যেখানে নাগরিকগণ পরস্পরের মতের বিরোধিতা করতে পারে এবং তা সহনীয় এবং স্বীকৃত। বস্তুত গণতন্ত্রের স্থিতি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সর্বতোভাবে নির্ভর করে রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিকের সহনশীল মনোভাব ও আচরণের উপর। রাজনৈতিক সহনশীলতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; এগুলো হলো: ব্যক্তি বিরোধী দল বা মতকে কতটুকু সহ্য করতে পারে; বিরোধী কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করে; এবং ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণগত সহনশীলতা।

বিরোধী দল বা মতের প্রতি সহনশীলতা (tolerance of opposition) হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিরোধী (opposition) বলতে একটি সংগঠিত জনগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলকে বোঝায়, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থেকে সরকারের কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করে। Dictionary of Politics-এ বিরোধী বা অপজিশনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "A loose association of individuals or political group or party wishing to change the government and alter its policy decisions." একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী শক্তি (opposition force) সেটি দল বা মত– যাই হোক না কেন, যখন সেটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তখনই গণতন্ত্র কার্যকর হয়। কারণ গণতন্ত্রের সার্থকতা এখানেই যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধিতা ও সমালোচনা করার অবাধ সুযোগ থাকে। শক্তিশালী বিরোধী দল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর এবং বাইরে থেকে সমালোচনা করে সরকারের দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট করে তুলতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী দলের ভূমিকাকে সঠিকভাবে লালনের জন্য বিভিন্ন আইনগত সুযোগ (various legislative devices) সৃষ্টি করে দেয়। এই legislative devices বিরোধী দল ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। সরকারের ভুলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং জনমতকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এর ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের রায় চায় এবং জনগণও সরকারের কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়নের সুযোগ পায়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল বা মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্রের অন্যতম তাত্ত্বিক Larry Diamond-এর মতে, গণতন্ত্র প্রকৃতিগতভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; যেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধী শক্তির উপস্থিতি

(opposition force) থাকে না সেখানে কোনো গণতন্ত্র থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভিন্নমত এবং তার প্রতি সহনশীলতা (tolerance of opposition) হলো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। James L. Gibson ও তাঁর সহযোগী লেখকগণ বলেন, "Without tolerance of opposition, widespread contestation is impossible, governmental legitimacy is imperilled and a lack of conformity becomes prevalent." Earnest Barker-এর মতানুসারে, democracy liberates opposition as 'anti-thesis', যার কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, বিরোধী দল বা মতের উপস্থিতি। এই opposition-এর অস্তিত্ব নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা কিংবা মন্ত্রিপরিষদের মধ্যেও থাকতে পারে। তিনি opposition-কে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'safety valve' হিসেবে অভিহিত করেছেন। গণতন্ত্র হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন দলের কর্মকাণ্ডের পথ অবারিত থাকে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশই কেবল এসব আদর্শকে লালন করতে পারে। উল্লেখ্য, গণতন্ত্র সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা ঠিকই, কিন্তু তার পূর্বশর্ত অনেক। এর মধ্যে একটি পূর্বশর্ত হলো বিরোধী দল বা বিরোধী গ্রুপের কার্যক্রমের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ গণতন্ত্রে বিরোধ থাকবে এবং তার ভিত্তিতে রাজনীতির মৌলিক বিষয়গুলোর মীমাংসা হবে। Michael Curtis বলেছেন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে একটি বৈধ ও শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে। সংসদ বা পার্লামেন্ট শুধু তাকে সহ্যই করবে না বরং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করারও সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এবং পার্লামেন্টে এর জন্য কিছু সময়ও মঞ্জুর করবে। সুতরাং দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম শর্ত হলো বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি আস্থা এবং তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন। একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী মত বা পক্ষকে যেমন গুরুত্ব দিতে হয়, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করাটাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আচরণগত সহনশীলতা হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম পূর্বশর্ত।

২. পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি উপাদান হলো পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ। এটি বলতে ব্যক্তির মধ্যে একে অন্যের প্রতি বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে বোঝানো হয়। গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য যেমন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ প্রয়োজন, তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রেও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের মধ্যে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এ

মূল্যবোধগত গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে এসব মূল্যবোধগত বিষয়কে বিবেচনা করা হয়। এসব গুণ যখন মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস-ব্যবস্থায় (political beliefs system) বিধিবদ্ধ কিংবা স্থায়ী রূপ ধারণ করে তখন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয় এবং গণতন্ত্র কার্যকর রূপ লাভ করে। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়কে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক মূলধন (cultural capital) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ বলতে বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারের কর্মকাণ্ড ও অন্যের মতামতের প্রতি trust-কে বোঝানো হয়েছে। এসব বিষয়কে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে trust & obedience কেবল civic association বিনির্মাণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ব্যক্তির রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ ও কার্যকারিতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকে তাহলে গণতন্ত্র কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না।

৩. সহযোগিতার মনোভাব

সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে গণতন্ত্র যেমন বিকশিত হতে পারে না তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও বিকশিত হতে পারে না। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব একান্ত অপরিহার্য। আধুনিক মানুষ যেমন সামাজিক জীব তেমনি রাজনৈতিক জীবও। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে যেমন পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজে বসবাস করতে হয় তেমনি রাজনৈতিক জীব হিসেবেও সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করতে হয়। সহযোগিতার বন্ধনকে অবলম্বন করেই মানুষ আদিকাল থেকে আধুনিকপর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছে। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেদে সহযোগিতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু সহযোগিতার মাত্রাগত ভিন্নতা কিংবা তারতম্য যাই হোক না কেন, মানুষ তার চিরন্তন স্বভাবগত আচরণের কারণেই পরস্পরকে সহযোগিতা করে। *International Encyclopedia of Social Science*-এ বলা হয়েছে, "Cooperation is joint or collaborative behavior that is directed towards some goal and in which there is common interest or hope of reward." একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি পরস্পরকে সহযোগিতা করার মনোভাব বিকশিত না হয় তাহলে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। কারণ, গণতন্ত্র টিকে থাকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। মৌলিকত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্র হলো সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে সমাজে বসবাসকারী

বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতার নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে। Diamond বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহের (elements) মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু কীভাবে এই গণতান্ত্রিক অভ্যাস (democratic practices) নাগরিকদের মধ্যে বিকশিত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, নিয়ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের জীবন বোধে একটি পরিবর্তন সাধিত হওয়ার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষায়, "Democracy does not mean only members. In democracy you will have to give and take. Democracy means agreement between people and friendship and cooperation."

৪. সমঝোতা ও ঐকমত্য

সমঝোতা ও ঐকমত্য বলতে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করা ও তদনুসারে আচরণ করাকে বোঝায়। গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন (rule by the people)। কিন্তু জনগণ শাসন করে না। তারা শাসন করার জন্য মত দেয়। তার ভিত্তিতে শাসকবর্গ ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম দুটো শর্ত হচ্ছে– জাতীয় এবং মৌলিক বিষয়ের সমঝোতা (compromise) ও ঐকমত্য (consensus) প্রতিষ্ঠা করা। হান্টিংটন (Huntington) বলেন, "অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ হিংস্রতা কম। কিন্তু গণতন্ত্রে শুধু আপোষ বা সমঝোতাই (compromise) থাকে না, দ্বন্দ্বও থাকে; যে কারণে গণতন্ত্রকে একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা (conflictual condition) হিসেবে মনে করা হয়। তবে গণতন্ত্রে এই দ্বন্দ্ব মীমাংসা হয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে।" অ্যালমন্ড ও ভারবার মতে, গণতন্ত্রে দ্বন্দ্ব থাকবে কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত নয়, এখানে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু তা থাকবে গ্রহণীয় চৌহদ্দির মধ্যে; গণতন্ত্রে বিভক্তি থাকবে তবে তার প্রশমন হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সারতরি (Sartori) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং ঐকমত্য– এ দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি বলেন যে, "মৌলিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব গণতন্ত্রের এমনকি কোনো ব্যবস্থারই সম্ভাব্য ভিত্তি হতে পারে না।" রবার্ট ডাল (Robert Dahl) ঐকমত্যের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র মূল্যবোধগত ঐকমত্যে স্থিরতা লাভ করে (anchored to value consensus)। তিনি আরও বলেন, "ঐকমত্য যত বেশি হবে গণতন্ত্র তত সফল হবে।" সুতরাং দেখা যায় যে, সমঝোতা ও ঐকমত্য গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিশেষ করে জাতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য জরুরি।

৫. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ; শাসনব্যবস্থা পছন্দ ও গণতন্ত্র মূল্যায়ন

ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে শুরু করে রাজনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির অংশীদার হওয়ার মাত্রাকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি বলতে জনগণ কোন্ ধরনের শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং গণতন্ত্রকে তারা কতটুকু সমর্থন করে ও মূল্যায়ন করে– তা বোঝানো হয়ে থাকে। রাজনীতি হলো এক প্রকার মানসিকপ্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে রাজনীতির ভাবনার প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে। একই কারণে রাজনৈতিক ক্রিয়া (political action) সম্পাদন কিংবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির (political orientation) ক্ষেত্রেও সমাজ ভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি। রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্টের কারণেই মানুষের মধ্যে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠে। পৃথিবীর সকল সমাজেই এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি মানুষের এই যে পৃথক পৃথক মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি– এটিকে তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানদণ্ডে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের এ প্রকাশ প্রতীকী (symbols) আকারেও হতে পারে, যার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র এবং রাজনৈতিক পছন্দের বিষয়টি উন্মোচিত হয়। আবার রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। শাসনব্যবস্থা পছন্দের বিষয়টি তাই নির্ভর করে কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। Almond and Verba বলেন, "When we speak of political culture of a society, we refer to the political system as internalized in the cognitions, feelings, and eveluations of its population." প্রসঙ্গত, Tolcott Parsons and Edward Shills রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তা হলো: (১) cognitive orientation; (২) affective orientation; ও (৩) evaluative orientation।

একটি সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো কী রকম হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ঐ সমাজের মানুষের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। Almond and Verba তাই রাজনৈতিক কাঠামোকে সংস্কৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন, একটি জাতি বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি রাষ্ট্রের সদস্যগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির নমুনার নির্দিষ্ট বণ্টন। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে একটি বিশেষ

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। Almond and Power বলেছেন যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ (objects) সম্পর্কে ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

৬. গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস না থাকলে যেমন গণতন্ত্র বিকাশিত হয় না তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠতে পারে না। অবশ্য মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিষয়টি পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য। কারণ বিশ্বাস হলো মনোজাগতিক ও পূর্ব ধারণামূলক দর্শন। তবে রাজনৈতিক আচরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিমাপের আপাত সুরাহা করা সম্ভব। বস্তুত মানুষের রাজনৈতিক আচরণে যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুসৃত রীতি-নীতিগুলো স্থান পায়, তাহলে ধরে নেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বর্তমান। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুসৃত রীতি-নীতিগুলোকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। Robert Dahl বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বিভিন্ন শর্ত ও রীতি-নীতির প্রতি নাগরিকদেরকে আনুগত্য পোষণ করতে হয়, সেসব শর্তকে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত বলে অভিহিত করা হয়। এসব শর্তের মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা অর্থাৎ নির্বাচন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আইনের শাসন. স্বাধীনতা ও সাম্য ইত্যাদি। নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শর্ত। বলা চলে, আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ হচ্ছে নির্বাচন। গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে নির্বাচনই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রকে যদি পদ্ধতিগত (procedural) দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের একমাত্র উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। হান্টিংটন মন্তব্য করেছেন, "নির্বাচন গণতন্ত্রের জীবনই কেবল নয়, বরং তা স্বৈরতন্ত্রের মৃত্যুও" (Elections are not only the life of democracy. They are also the death of dictatorship)।

৭. নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনা

এটি বলতে জনগণ নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কতটুকু সচেতন এবং তারা তা পালন করে কি-না, তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন নাগরিক জ্ঞানসমৃদ্ধ (civic sense) সচেতন নাগরিকগোষ্ঠী। বর্তমান প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে যদিও নাগরিকদের সরাসরি শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের

সুযোগ সীমিত, তথাপি নাগরিক কথাটির সঙ্গে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিক সমাজের সচেতনতা, সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব। একজন নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের নিকট থেকে বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যও তাকে পালন করতে হয়। নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে একপ্রকার দায়িত্বশীলতা (obligation)। A. C. Kapur মন্তব্য করেছেন যে, যখন একজন নাগরিক দায়িত্বশীলতার অধীনে আসে তখনই তার প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জ্ঞান বা সচেতনতার বিকাশ ঘটে। Almond and Verba সুনাগরিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, একজন নাগরিক তখনই সুনাগরিক যখন সে তার obligation সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকবে এবং তা পালনের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। তাঁদের মতে, একজন ব্যক্তি যদি কাঠমিস্ত্রি হয় তাহলে যেমন তার ভালো মিস্ত্রি হওয়া উচিৎ তেমনি একজন নাগরিক যদি সুনাগরিক হয় তাহলে তাকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে এবং তা পালনের জন্য নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একজন নাগরিক তখনই সুনাগরিক হবে যখন সে তার দায়িত্ব পালন করবে। নাগরিক জ্ঞান বা নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা হলো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বলাবাহুল্য গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ কখনই সম্ভব নয় যদি না নাগরিকদের মধ্যে civic sense এর বিকাশ ঘটে।

৮. রাজনৈতিক সচেতনতা ও মূল্যায়ন

সচেতনতা ও মূল্যায়ন বলতে সরকার ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং সরকার ও বিরোধী দলের বিভিন্ন কার্যক্রম ও নীতির সমালোচনামূলক মূল্যায়নে ব্যক্তির সক্ষমতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। রাষ্ট্র কিংবা সরকারি নীতি-প্রক্রিয়ার প্রতি সজাগ থাকা এবং এসব প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে সাধিত হয় তা যখন নাগরিকদের অবগতির মধ্যে থাকে তখনই বলা যায় ঐ রাষ্ট্র বা জনপদের নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা আছে, যা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম শর্তও বটে।

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয় বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ দীর্ঘ সংগ্রামের পেছনে মূল প্রেরণা ছিল গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা– যেখানে শোষণ থাকবে না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে এবং সর্বোপরি প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে তুলবে। নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ ও সহনশীলতার

পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলো বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, অথচ অদ্যাবধি রাজনৈতিক কাঠামোতে গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোতে বিশেষ করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানগুলো কতটুকু বিকাশিত হয়েছে তা আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির তাত্ত্বিক উপাদানগুলো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করলে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের উপাদানগুলো এখনও পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয়নি। উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসৃত নীতিগুলোকে কার্যকর করা এবং সরকারকে দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এমনকি সাধারণ জনগণের মধ্যেও বিরোধী দল বা মতকে সহ্য করার মানসিকতা গড়ে উঠেনি। অধিকন্তু বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামতেরই প্রতিফলন ঘটে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এদের অবদান যথেষ্ট। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে জাতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগণ যদি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে তাহলে এদেশে গণতন্ত্র সফলতা অর্জন করতে পারে। কারণ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য গণতন্ত্রের সহায়ক সংস্কৃতি দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিদ্যমান নেই।

উপসংহার

একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুসারেই সাধারণত সে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোসমূহ ও ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সংস্কৃতি ও কাঠামোর মধ্যে নিবিড় ইতিবাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ তাদের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপস্থিতি। গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসন। কিন্তু জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে না। শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এক্ষেত্রে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করে মাত্র। সুতরাং সেই নির্বাচকমণ্ডলী তথা সাধারণ জনগণের মধ্যে এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বা

চেতনার বহিঃপ্রকাশ খুব একটা দেখা যায় না। আমরা যদি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলো যেমন সহনশীলতা; পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বোধ; সহযোগিতার মনোভাব; সমঝোতা ও ঐকমত্য; রাজনৈতিক অংশগ্রহণ; শাসনব্যবস্থা পছন্দ ও গণতন্ত্র মূল্যায়ন; গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস; নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনা; এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সচেতনতা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়কে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিবেচনায় আনি, তাহলে দেখা যাবে যে, এর কোনো উপাদানই পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে বিকশিত হয়নি। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

সুতরাং বাংলাদেশে গণতন্ত্র নির্মাণের বিষয়টি নির্ভর করবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু চর্চা ও পরিমিতি বোধের উপর।

References:

1. Huntington, S. P., *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahama Press, 1991. p. 16.
2. Diamond, "Introduction: Persistence, Erosion, Breakdown and Renewal", in Diamond, Linz and Lipset (eds), *Democracy in Asia,* Vistaar Publication, 1989, p. 10.
3. মাসুম, আব্দুল লতিফ,"বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির ভাষা : একটি বিশ্লেষণ", *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, সংখ্যা ৫, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ২০০০।
4. Lipset , Seymour Martin, *The Encyclopedia of Democracy*, Vol. III, Routledge, London, 1995, p. 966.
5. Brient, Michael, *A Genealogy of Political Culture*, Westview Press, 1991, p. 4.
6. Black, James A. and Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research,* John, Wiley and Sons, NY, 1976, p.109.
7. Almond G.A. and Sidney Verba, *The Civic Culture*, Princeton, NJ, 1972, pp. 6-35.
8. Baechler, Jean, *Democracy: An Analytical Survey*, UNESCO Publishing, 1995, pp. 127-134.
9. Honderich Ted (ed), *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford University Press, 1995, p. 877.
10. *Dictionary of Politics*, Penguin Books, London, 1986, p. 243.
11. Lipset, S. M., "Reflection on Capitalism, Socialism & Democracy," Journal of *Democracy* , Vol. 4, No.-2, April 1993, pp. 47-50.
12. Diamond. Larry, "Three Paradoxes of Democracy." Journel of Democracy, Vol. 1, No-3, Summer 1993, pp.48-49.
13. Quoted in Hasanuzzaman, Al Masud, Role of Opposition in Bangladesh Politics, UPL, 1998, p. 8.
14. Barker, Ernest, *Reflection on Government*, Oxford University Press, 1942-1967, London, pp. 202-203.

15. Curtis, Michael, *Comparative Government & Politics*, 2nd ed, Harper & Row Publishers, New York, 1978, p. 212.
16. Sills, L.David (ed), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company, Vol. 3, p. 384.
17. Diamond, Larry, "Three Paradoxes of Democracy" in The Journal of Democracy, Vol. 1, No. 3 Summer 1993, pp. 56-57.
18. উদ্ধৃতি সংগৃহীত জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮।
19. Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Framework for Analysis*, Vol. 1, Cambridge University Press, 1976, pp, 15-16.
20. Held, David, *Models of Democracy*, Polity Press, 1987, p. 194.
21. Ball, Alan R., *Modern Politics and Government*, The Macmillan Press Ltd, 1977, p p. 52-60
22. Persons, Talcott and Edward A. Shills, *Toward a General Theory of Action,* Cambridge, Mass, 1951, p. 53.
23. Almond & Powell, *Comparative Politics: A Development Approach*, Oxford and IBH Publishing Co. 1966, p. 66.
24. Dahl, Robert A., *Polyarchy and Opposition*, New Haven, CT : Yale University Press, 1971, pp. 3-20.
25. Verba, Sidney, Norman H. Nie and Jae-on-Kim, *Political Participation and Political Equality ; A Seven Nation Comparison*, Cambridge University Press, 1978, pp. 46-47.
26. Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Union Paperbacks, 1987, p. 269.
27. আলম, মো: শামছুল, "রাজনীতি ও হরতাল: বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট", *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*, ১৯৯১, পৃ. ১।
28. Kapur, A.C., *Principles of Political Science*, S. Chand & Company Ltd, New Delhi,1992, p. 227.
29. আলী, সৈয়দ মকসুদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬৯.
30. Lipset, S. M., *Political Man*, Arnold Heinemann India, New Delhi, 1973. p. 212.